

প্রেস বিজ্ঞপ্তি

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

খিলাফত রাষ্ট্র ধ্বংসের ১০২তম হিজরী বার্ষিকী উপলক্ষে হিব্বুত তাহরীর-এর আমীর বিশিষ্ট ইসলামী চিন্তাবিদ আতা
বিন খলিল আবু আল-রাশতাহ্-এর বক্তব্য

(অনুবাদকৃত)

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ সুবহানাছ ওয়া তা'আলা'র, এবং রহমত ও শান্তি বর্ষিত হোক আল্লাহ'র রাসূল (সাঃ), তাঁর পরিবার, তাঁর
সাহাবাগণ (রা.), এবং তাঁর (সাঃ) অনুসারীদের উপর,

ইসলামী উম্মাহ'র প্রতি... এবং বিশেষ করে খিলাফত রাশিদাহ্ পুনঃপ্রতিষ্ঠার কাজে নিয়োজিত দাওয়াহ্ বহনকারীদের প্রতি...

আসসালামু আলাইকুম ওয়া রহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু,

২৮শে রজব ১৩৪২ হিজরীতে, খ্রিস্টীয় সন অনুসারে দিনটি ছিল ১৯২৪ সালের ৩রা মার্চ, অর্থাৎ ১০২ হিজরী বছর পূর্বে এই দিনে
তৎকালীন বৃটেনের নেতৃত্বে ঔপনিবেশিক কাফিরগণ আরব ও তুর্কি বিশ্বাসঘাতকদের সহায়তায় খিলাফত রাষ্ট্র ধ্বংস করতে সক্ষম হয়।
ইস্তাম্বুলে খিলাফত রাষ্ট্র ধ্বংস করার মাধ্যমে মুস্তফা কামাল প্রকাশ্য কুফর করার অপরাধ সংঘটিত করে, সে খলিফাকে অবরোধ করে এবং
সেদিন ভোর হওয়ার আগেই তাকে নির্বাসনে পাঠায়। এবং এভাবেই সংঘটিত হয়, মুসলিম ভূ-খণ্ডের মধ্যেই খিলাফত ধ্বংসের এই
বেদনাদায়ক ঘটনাটি... উম্মাহ'র উপর দায়িত্ব ছিল প্রকাশ্য কুফরকারীর বিরুদ্ধে তরবারী হাতে যুদ্ধে লিপ্ত হওয়া, যেমনটি উবাদাহ্ ইবনে
আল-সামিত (রা.) হতে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর মুত্তাফিকুন আলাইহি হাদিসে উল্লেখ রয়েছে:

«وَأَنْ لَا تُنَازِعَ الْأَمْرَ أَهْلَهُ إِلَّا أَنْ تَرَوْا كُفْرًا بَوَاحًا عِنْدَكُمْ مِنَ اللَّهِ فِيهِ بُرْهَانٌ»
না, যতক্ষণ পর্যন্ত না তোমরা তাকে প্রকাশ্য কুফর করতে দেখ, যার ব্যাপারে আল্লাহ প্রদত্ত বিধান অনুসারে তোমাদের কাছে সুস্পষ্ট প্রমাণ
রয়েছে» (বুখারী এবং মুসলিম)। অথচ উম্মাহ্, নিকৃষ্ট এই অপরাধী ও তার সহযোগীদের ভীত ও প্রকম্পিত করতে এমন কিছু করেনি,
যাতে সে ও তার সহযোগীরা পরাজিত হতে পারতো। বরং, উম্মাহ'র প্রতিক্রিয়া ছিল অত্যন্ত দুর্বল, যা তাদেরকে পরাজিত করতে
প্রয়োজনীয় পদক্ষেপের ধারেকাছেও ছিল না!

তখন থেকেই উম্মাহ'র পৌরবময় ইতিহাস অন্ধকারে নিমজ্জিত হয়ে যায়। ইতিপূর্বে, সত্য ও ন্যায়ের উপর অধিষ্ঠিত এই খিলাফত
ছিল উম্মাহ'র রাষ্ট্র, অথচ এখন উম্মাহ'র রয়েছে রাষ্ট্র নামে পঞ্চাশটিরও অধিক খণ্ডিত ভূখণ্ড, সাথে সেখানকার শাসকদের নিদারুণ যুলুম-
নির্যাতন। এমনকি এই রজব মাসের মাঝামাঝিতে ঘটে যাওয়া সিরিয়া ও তুরস্কের ভয়াবহ ভূমিকম্পও তাদের বিভক্তি দূর করতে পারেনি,
পারেনি একক রাষ্ট্র হিসেবে ঐক্য পুনরুদ্ধার করতে। উপদেশ গ্রহণ না করে, তারা বরং ভূমিকম্পের আগের অবস্থার মতো পরেও খণ্ডিত
টুকরো হিসেবেই থাকতে বদ্ধপরিকর! আল্লাহ সুবহানাছ ওয়া তা'আলা বলেন:

«أَوَلَا يَرَوْنَ أَنَّهُمْ يُفْتَنُونَ فِي كُلِّ عَامٍ مَّرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ لَا يَتُوبُونَ وَلَا هُمْ يَذْكُرُونَ»
দু'একবার বিপর্যস্ত হচ্ছে, অথচ, তারা এরপরও তওবা করে না কিংবা উপদেশ গ্রহণ করে না» [সূরা আত-তাওবা: ১২৬]।

এতদসত্ত্বেও, ভূমিকম্পের এই বিপর্যয় তুলে ধরেছে যে, ইসলাম মুসলিমদের হৃদয় গভীরে অবিচল অবস্থানে রয়েছে। ধ্বংসস্তূপের
নিচ থেকে যখন তারা তাদের ভাইদের উদ্ধার করছিল তখন তারা তাকবীর ধ্বনি উচ্চারণ করছিল। তাদের মুখের তাকবীর ধ্বনি বন্ধ হয়নি,
বিশেষ করে যখন তারা একটি শিশুকে উদ্ধার করছিল, যার মা তাকে জন্ম দেয়ার পর ধ্বংসস্তূপের নিচে মৃত্যুবরণ করেন... অথবা
ধ্বংসস্তূপে চাপা পড়া সেই ব্যক্তি যাকে হাতে তসবীহ আঁকড়ে ধরা অবস্থায় দেখা যায়, আর সেটা দিয়ে তিনি মহান আল্লাহ সুবহানাছ ওয়া
তা'আলা'র মহিমা ঘোষণা করছিলেন... অথবা যখন তারা একজন মহিলাকে ভেঙে পড়া ভবনের নিচ থেকে উদ্ধার করার চেষ্টা করছিল,
তখন মহিলাটি বাইরে বের করার আগে তার মাথা ঢেকে রাখার অনুরোধ জানায়, যাতে তার চুল দেখা না যায়... অথবা যখন এক ব্যক্তি
ধ্বংসস্তূপের নিচ থেকে তাকে বের করার জন্য ডাকাডাকি করছিলেন, যিনি প্রথমেই সালাত পূর্ব ওয়র জন্য পানি চেয়েছিলেন যাতে তিনি

নামাযের সময় অতিক্রান্ত করে না ফেলেন... কিংবা সেই ব্যক্তি যাকে তারা ধ্বংসস্তুপের ভিতর থেকে উদ্ধার করার চেষ্টা করছিল, আর তারা তাকে পবিত্র কুর'আনের সূরা আল-বাকারাহ থেকে তেলাওয়াতরত অবস্থায় খুঁজে পায়... অথবা সেই মেয়েটি যাকে তারা বের করার চেষ্টা করছিল, এবং সেদিনকার নামাজ পড়তে না পারায় সে আক্ষেপ করছিল... এবং এই সবগুলো ক্ষেত্রেই তাকবীর ধ্বনি উচ্চারিত হয়েছিল, আল্লাহ্ আকবার... এরাই মুসলিম। ভূমিকম্পে নিহত প্রত্যেক মুসলিমের প্রতি আল্লাহ্ সুবহানাহ্ ওয়া তা'আলা রহমত করুন। আল্লাহ্ সুবহানাহ্ ওয়া তা'আলা'র আদেশক্রমে তারা যেন আখেরাতের শহীদদের অন্তর্ভুক্ত হন। আল্লাহ্ এমন আরোগ্য দ্বারা আহতদের সুস্থতা দান করুন, যা কোন রোগকে অবশিষ্ট রাখে না... বেঁচে যাওয়া প্রতিটি মুসলিমকে আল্লাহ্ সাহায্য করুন। আল্লাহ্ তাদের জন্য উত্তম জীবন দান করুন, যা তারা আল্লাহ্ এবং তাঁর রাসূল (সাঃ)-এর আনুগত্যে ব্যয় করবে...

তরাই মুসলিম, অথচ তাদের বিপরীতে রয়েছে মুসলিম ভূ-খণ্ডসমূহের শাসকগণ। বাস্তবিকভাবেই তারা ভিন্ন মেরুতে অবস্থান করছে। খিলাফত ধ্বংসের মহাবিপর্ষয়ের সময় থেকে শুরু করে বিগত ১০২ হিজরী বছরে এই অবস্থানগত পার্থক্য তৈরী হয়েছে! অতঃপর খিলাফতের ধ্বংসকে কাজে লাগিয়ে ঔপনিবেশিক কাক্ষিরগণ আরও একটি যন্ত্রণাদায়ক ক্ষতের জন্ম দেয়। তারা ইহুদিদেরকে বরকতময় ভূমিতে একটি রাষ্ট্র প্রদান করে, যে পবিত্র ভূমি ইসরার (রাত্রি যাত্রা) গন্তব্যস্থল এবং রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর মিরাজের (উর্ধ্বগমন) সূচনাস্থল। এরপর তারা তাদেরকে টিকিয়ে রাখার উপায়সমূহ নিশ্চিত করে। এই উপায়সমূহের মধ্যে যা সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ ছিল সেটা হচ্ছে, এটিকে ঘিরে থাকা দালাল শাসকদের মাধ্যমে এর নিরাপত্তা নিশ্চিত করা। তাই তারা ইহুদিদের সাথে সংঘটিত প্রতিটি যুদ্ধে পরাজিত হতে থাকে, যতক্ষণ না আল্লাহ্ সুবহানাহ্ ওয়া তা'আলা ইহুদিদেরকে যেভাবে চিত্রায়িত করেছেন এর বাইরে গিয়ে তারা তাদের জন্য নতুন ভাবমূর্তি তৈরিতে সক্ষম হয়: ﴿وَضَرَبْتُ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةَ وَالْمَسْكَنَةَ﴾ “আর তাদের উপর আরোপ করা হলো লাঞ্ছনা ও পরমুখাপেক্ষিতা” [সূরা আল বাকারাহ: ৬১]। আর শাসকগণ কেবল এতটুকুতেই সন্তুষ্ট ছিল না। বরং, তারা ইহুদি রাষ্ট্রের অপসারণ বিষয়টিকে এটির সাথে সমঝোতায় বিষয়ে পরিণত করতে সর্বশক্তি নিয়োগ করলো, এই আকুতি সহকারে যে এটি ১৯৬৭ সালে দখল করা কিছু অংশ থেকে নিজেকে প্রত্যাহার করবে।

উপরন্তু, ফিলিস্তিনে অবৈধ ইহুদি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা ছিল সবচেয়ে জঘন্য অপরাধ, এবং এখনও এটি জঘন্য অপরাধ করে চলেছে। ২০২৩ সালের ২৬শে জানুয়ারিতে জেনিনে সংঘটিত হত্যায়ত্ত্ব এর সাক্ষী। অবৈধ ইহুদি রাষ্ট্রের সেনাবাহিনী বিশাল এবং ভারী অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত বাহিনী নিয়ে জেনিন শিবিরে হামলা করে ও হত্যায়ত্ত্ব চালায়, যেখানে নয়জন শহীদ হয়। সেসময়ে তারা হত্যায়ত্ত্ব চালিয়ে, আহতদের উপর দেয়াল ভেঙ্গে এবং বুলডোজার দিয়ে দলিত করে চরম অপরাধ সংঘটিত করে। এরপর এটি নাবলুসের বিরুদ্ধে তার আগ্রাসন অব্যাহত রাখে, এবং আকাবাত জাবের ক্যাম্পে হামলা চালিয়ে হত্যায়ত্ত্ব চালায় ও আহত করে, যার ফলে বহু মানুষ শহীদ ও হতাহত হয়... আর এসবই ঘটে মুসলিম ভূ-খণ্ডসমূহের শাসকদের নাকের ডগায় যারা তাদেরকে উদ্ধারের জন্য সৈন্য সমাবেশ করেনি। বরং, তাদের মধ্যকার উল্লেখযোগ্যতম ব্যক্তির পদক্ষেপ হচ্ছে, যেকিনা অপরাধীদের সাথে অপরাধের শিকার ব্যক্তিদের মধ্যস্থতা প্রস্তাব করেছে! আল্লাহ্ তাদেরকে ধ্বংস করুন; কিভাবে তারা বিভ্রান্ত হয়? এবং কিভাবে তারা এর চেয়ে বড় অপরাধ তথা ইহুদিদের সাথে সম্পর্ক স্বাভাবিকীকরণের মত ঘৃণ্য অপরাধে লিপ্ত হতে পারে? মিশরের শাসকেরা এই অপমান ও অসম্মানের মিছিলে নেতৃত্ব দিয়েছিল, এরপর পি.এল.ও, এবং তারপর যথাক্রমে জর্ডান, সংযুক্ত আরব আমিরাত, বাহরাইন এবং মরক্কোর শাসকগণ সকলেই একই পথ অনুসরণ করেছে। এবং এখন সুদান একই অপরাধে তাদেরকে অনুসরণ করেছে, কারণ সুদানের রাষ্ট্রপতি আল-বুরহান অবৈধ ইহুদি রাষ্ট্রের সাথে সম্পর্ক স্বাভাবিকীকরণ নিয়ে আলোচনার উদ্দেশ্যে ০২/০২/২০২৩ তারিখে খার্তুমে ইহুদি রাষ্ট্রের পররাষ্ট্রমন্ত্রী এলি কোহেনের সাথে সাক্ষাৎ করে! তাদের কেউই তাদেরকে ঘিরে থাকা অপমানের পরোয়া করেনি, ﴿سَيُصِيبُ الَّذِينَ أَجْرَمُوا صَغَارٌ عِنْدَ اللَّهِ وَعَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا كَانُوا يَمْكُرُونَ﴾ “যারা এই অপরাধ করেছে তারা অচিরেই তাদের ষড়যন্ত্রের প্রতিফল হিসেবে আল্লাহ্'র পক্ষ থেকে লাঞ্ছনা এবং কঠোর আযাবের সম্মুখীন হবে” [সূরা আল-আনআম: ১২৪]।

এটা সত্যিই আশ্চর্যজনক যে, অবৈধ ইহুদি রাষ্ট্র কর্তৃক আক্রমণের মাত্রা বৃদ্ধির সাথে সাথে কিংবা প্রতিটি অপরাধ সংঘটনের সময়ে এর নেতারা হয় হামলার আগের দিন অথবা একই দিন আরব শাসকদের সাথে হাত মেলাতে থাকে বা তাদের সাথে সাক্ষাতের জন্য সফর করে। জেনিনের উপর হামলার অপরাধ সংঘটনের আগে নেতানিয়াহ্ জর্ডানের রাজপ্রাসাদে অতিথি হিসেবে ছিল! ফিলিস্তিন কর্তৃপক্ষ এই

সত্যতা স্বীকার করে নিয়েছিল যে জেনিনের উপর হামলার অপরাধ সংঘটনের সময়ে ইহুদিদের সাথে তারা নিরাপত্তা সমন্বয় সাধন করছিল, কারণ এই অপরাধের পর তারা দাবি করেছিল যে তারা নিরাপত্তা সমন্বয় বন্ধ করে দিবে। অতএব এটা এরকমই ছিল! যাহোক, সবচেয়ে বিস্ময়কর ও আশ্চর্যজনক বিষয় হচ্ছে, জেনিনে হত্যাকাণ্ডের পর যখন ফিলিস্তিনের একজন বীর তার ভূমি ও জনগণকে রক্ষায় এগিয়ে আসে এবং আল-কুদস অপারেশনে সাতজন ইহুদিকে হত্যা করে, তখন মুসলিম দেশগুলোর শাসকগণ নিন্দা জানানোর জন্য ছুটে আসে! তুরস্ক, সংযুক্ত আরব আমিরাত, জর্ডান ও মিশরের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় সকলেই প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে আল-কুদস অপারেশনের নিন্দা করে!

এখন, কেবল ফিলিস্তিনই নয় যার পিঠে এসব শাসক ছুরিকাঘাত করেছে, বরং তারা ইসলামী ভূ-খণ্ডসমূহের অন্যান্য পবিত্র অঞ্চলগুলোকেও সমর্পণ করেছে। হিন্দু মুশরিকরা জোরপূর্বক কাশ্মীরকে তাদের রাষ্ট্রের সাথে যুক্ত করে নেয়, আর পাকিস্তানের শাসকেরা নীরব ভূমিকা পালন করে... মিয়ানমারে রোহিঙ্গা মুসলিমদেরকে হত্যা করা হচ্ছে, অথচ বাংলাদেশের শাসকেরা যেন তা না দেখে ঘুমিয়ে আছে... তাছাড়া রয়েছে পূর্ব তুর্কিস্তান, যেখানে চীন গণহত্যা চালাচ্ছে, অথচ মুসলিম ভূ-খণ্ডসমূহের বর্তমান দেশসমূহ কবরের নিস্তরঙ্গতার মতো পাথরসম নীরবতা পালন করেছে। আর যখন তারা গণহত্যার বিষয়ে কথা বলে, তখন তারা দাবি করে যে এটি চীনের অভ্যন্তরীণ বিষয়! ﴿كَبُرَتْ كَلِمَةً تَخْرُجُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ إِنَّ يَقُولُونَ إِلَّا كَذِبًا﴾ “কি ভয়ানক দাবি যা তাদের মুখ থেকে বের হয়! তারা মিথ্যা ছাড়া কিছুই বলে না” [সূরা আল-কাহাফ: ৫]।

অতঃপর, ঔপনিবেশিক কাফিররা উম্মাহ্'র উপর যে অসম্মান আরোপ করেছিল তাতে তারা সন্তুষ্ট ছিল না। ফলে তারা উম্মাহ্'র বিশ্বাসের অবমাননা করতেও দ্বিধাবোধ করেনি। তাই সুইডিশ কর্তৃপক্ষ অনুমতি দেয়ার পর এক মামুলি চরমপন্থী শনিবার, ২১শে জানুয়ারী ২০২৩ তারিখে স্টকহোমে তুর্কি দূতাবাস ভবনের সামনে মহান কুর'আনের একটি কপি পোড়ানোর দুঃসাহস দেখায়... এরপর তারা ধারাবাহিকভাবে হেগ এবং কোপেনহেগেনে শুক্রবার, ২৭শে জানুয়ারীতে মহান কুর'আন পোড়ানোর জঘন্য অপরাধ অব্যাহত রাখে। পরবর্তীকালে, আমরা আল-আজহারকে দেখেছি যে তারা তাদের 'আল-আজহার অবজারভেটরি ফর কমব্যাটিং এক্সট্রিমিজম'-এর মাধ্যমে একটি কঠোর শব্দযুক্ত বিবৃতি জারি করে ধর্মীয় পবিত্রতা লঙ্ঘন প্রচেষ্টার তীব্র নিন্দা এবং এধরনের ঘটনা রুখে দাঁড়ানোর দাবি জানায়। এতে কোন সন্দেহ নেই, আল-আজহারের উলামায়ে কেরামগণ ভালভাবেই জানেন যে মহান কুর'আন পোড়ানোর প্রতিক্রিয়া কেবল মৌখিক নিন্দা জানানো হতে পারে না, বরং আল্লাহ্'র কিতাব ও তাঁর দ্বীনের সমর্থনে অবশ্যই সামরিক বাহিনী প্রেরণ করতে হবে। মহান কুর'আন পোড়ানোর অর্থ হচ্ছে ইসলামী উম্মাহ্ এবং এর বিশ্বাসের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করা। অতএব, সঠিক প্রতিক্রিয়া হচ্ছে যুদ্ধ ঘোষণা, যা তাদের জন্য একটি ভীতি-সৃষ্টিকারী উদাহরণ তৈরি করবে, এবং এটা অন্যদেরও এধরনের জঘন্য অপরাধ করা থেকে নিবৃত্ত করবে। আল্লাহ সুবহানাহ্ ওয়া তা'আলা বলেন: ﴿فَإِنَّمَا تَتَفَنَّاهُمْ فِي الْحَرْبِ فَشَرِدَ بِهِمْ مِنْ خَلْفِهِمْ لَعَلَّهُمْ يَنْكَرُونَ﴾ “তোমরা যদি কখনো যুদ্ধে তাদের মুখোমুখি হও, তবে তাদের জন্য একটি ভয়ঙ্কর উদাহরণ তৈরি কর, যাতে তাদেরকে যারা অনুসরণ করবে তারা নিরুৎসাহিত হতে পারে” [সূরা আল-আনফাল: ৫৭]।

হে মুসলিমগণ: মুখ রক্ষার জন্য কেবল শোভিত শব্দ ব্যবহার করে মুসলিমদের বিরুদ্ধে আগ্রাসনকে মোকাবিলা করার সুযোগ নেই, কারণ ফাঁকা বুলি কোন কল্যাণ বয়ে আনে না কিংবা প্রয়োজনও পূরণ করে না। বরং তলোয়ারের ফলা দ্বারা এমন আঘাতের মাধ্যমে আগ্রাসনকে প্রতিহত করতে হয় যা শত্রুকে শয়তানের ওয়াসওয়াসা ভুলিয়ে দেয়। যখন মুসলিমদের খিলাফত ছিল তখন তারা এই রকমই ছিল, এবং তাদের শাসনামলের ঘটনাপ্রবাহে এসম্পর্কিত বিস্তৃত ইতিহাস রয়েছে। এটি এমন এক প্রমাণিত সত্য যা দূরদৃষ্টি ও অন্তর্দৃষ্টি সম্পন্ন কোন ব্যক্তিই অস্বীকার করতে পারে না। মুসলিমদের ইতিহাসে এসব উদাহরণ বিদ্যমান, অন্যান্য উৎসসহ যেগুলো ইবনে কাছিরের “দ্য বিগিনিং অ্যান্ড দ্য এন্ড”, আল-বালাধুরির “দ্য কনকোয়েস্ট অফ দ্য ল্যান্ডস”, ইবনে খালদুনের “দ্য হিস্ট্রি”, এবং আল-যাহাবির “দ্য হিস্ট্রি অফ ইসলাম” গ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে। এসব গ্রন্থ থেকে আমি এখন আপনাদের জন্য কয়েকটি উদ্ধৃত করছি:

“অতঃপর হিজরতের পরে ৮৭তম বছর এলো... এই সময়ে কুতায়বা ইবনে মুসলিম বুখারার পয়কেন্ট নামক জেলা জয় করলেন... এবং তখন সময় মধ্যাহ্ন হয়নি, যে পর্যন্ত না আল্লাহ সুবহানাহ্ ওয়া তা'আলা তাদের বিজয় দান করেন... তাদের মধ্যে একজন একচোখা ব্যক্তি ছিল যে মুসলিমদের উপর আঘাত হানে। যখন তাকে বন্দী করা হয় তখন সে বলেছিল: “আমি নিজের মুক্তিপণ হিসেবে পাঁচ হাজার

চাইনিজ পোশাক দিতে চাই, যার মূল্য হাজার হাজার”। তখন কমান্ডারগণ কুতায়বাকে তার কাছ থেকে তা গ্রহণ করার পরামর্শ দেন। কিন্তু কুতায়বা বলেছিলেন: “না, আল্লাহ্‌র কসম, তুমি আর কখনো কোনো মুসলিমের মনে ভীতি সঞ্চার করতে পারবে না”। অতঃপর তিনি তার সম্পর্কে আদেশ করেন এবং তার গর্দানে আঘাত করা হয়...”

“এরপর এলো হিজরতের পর ৯০তম বছর... এই সময়ের মধ্যে সিন্ধুর শাসক রাজা দাহির মুসলিম নারীদের বহনকারী একটি জাহাজে আক্রমণ করে এবং তাদেরকে বন্দী করে নিয়ে যায়। সেই অত্যাচারীর উপর প্রতিশোধ নেয়ার জন্য খলিফা তার ওয়ালীকে (গভর্নর) বার্তা পাঠান। তখন মুহাম্মাদ বিন আল-কাসিম একটি সৈন্যবাহিনীর নেতৃত্ব দেন এবং “মুসলিম মহিলাদের উদ্ধার করেন, সেই অত্যাচারী শাসকের বিরুদ্ধে প্রতিশোধ নেন এবং সিন্ধু ভূমি জয় করেন।”

“অতঃপর হিজরতের পর ২২৩তম বছরের আগমন ঘটে... এবং বাইজেন্টাইন রাজা মুসলিম ভূমিতে অভিযান পরিচালনা করে, এবং জাবতারার লোকদের হত্যা ও বন্দী করে। তখন একজন মহিলা ডেকে উঠেছিলেন: “হে মু'তাসিম, তুমি কোথায়?” এই আহ্বানটি খলিফা আল-মু'তাসিমের কাছে পৌঁছেছিল, তিনি উত্তরে বলেছিলেন, “আপনার সেবায়”। তিনি ব্যক্তিগতভাবে একটি সেনাবাহিনীর নেতৃত্ব দেন এবং মহিলার জন্য প্রতিশোধ নেন। তিনি জিজ্ঞেস করেন যে বাইজেন্টাইনদের কোন ভূমি সবচেয়ে বিশাল। তাকে বলা হয়েছিল যে সেটি হচ্ছে আমোরিয়াম, যা “আম্ফারার নিকটবর্তী” ছিল। তাই তিনি সেটা জয় করে নেন”।

“এরপর হিজরতের পরে ৫৮২তম বছর এলো... এই সময়ে আল-কারাকের দখলদার আরনাত (রেনাল্ড) বিশ্বাসঘাতকতা করে মিশর থেকে আসা হাজীদের এক বড় কাফেলার রাস্তা অবরোধ করে রাখে, এবং তাদেরকে সে বন্দী ও হত্যা করে করে। অতএব সুলতান সালাহুউদ্দীন যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হন। তিনি সারাদেশ থেকে সৈন্য জড়ো করেন। তিনি প্রতিজ্ঞা করেন যে যদি তিনি আরনাতের উপর বিজয়ী হন তবে তিনি তাকে হত্যা করবেন। তাই আল্লাহ সুবহানাহ ওয়া তা'আলা তাকে ৫৮৩ হিজরী বছরে রবিউস সানি (রাবি আল-আখিরাহ) মাসের মাঝামাঝিতে হাভিনের যুদ্ধে বিজয়ী করেন। এরপর সালাহুউদ্দীন আরনাতকে তার বিশ্বাসঘাতকতা ও রাস্তা অবরোধ করার শাস্তি হিসেবে নিজের হাতে হত্যা করেন। তখনই আল-আকসা মুক্ত হয়, হিজরী ৫৮৩ সালে রজব মাসের ২৭ তারিখে”।

“তারপর হিজরী ১৩০৭ সালে, ইংরেজী ১৮৯০ খ্রিস্টাব্দে, একজন লেখক তার পাণ্ডুলিপিতে (স্ক্রিপ্টে) রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে অপবাদ দেয় এবং প্যারিসের এক থিয়েটারে সেটিকে একটি নাটক হিসেবে প্রদর্শনের চেষ্টা করে। খলিফা আবদুল হামিদ যখন বিষয়টি জানতে পারেন, তখন তিনি ইস্তাম্বুলে ফরাসি রাষ্ট্রদূতকে ডেকে পাঠান এবং ইচ্ছাকৃতভাবে সামরিক ইউনিফর্ম পরিধান করে তার সাথে দেখা করেন। তারপর তিনি তাকে হুমকি দেন যে, যদি নাটকটি দেখানো হয় তবে উসমানীয় খিলাফত ফ্রান্সের সাথে সমস্ত সম্পর্ক ছিন্ন করবে এবং যুদ্ধের ঘোষণা দেবে। তিনি তাকে কড়া সুরে সম্বোধন করে বলেছিলেন: “আমি মুসলিমদের খলিফা... আমি বলছি এই নাটক মঞ্চস্থ বন্ধ কর। না হয় সারা দুনিয়া আমি তোমাদের মাথার উপর আছড়ে ফেলবো”। এই হুমকির প্রেক্ষিতে ফ্রান্স নাটকটি প্রদর্শন করা থেকে বিরত হয়...”

ঔপনিবেশিক কাফিররা সেসময়ে সচেতন ছিল যে, ইসলাম ও মুসলিমদের পবিত্রতা লঙ্ঘন করলে জিহ্বা কেটে ফেলা হবে এবং অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ভেঙ্গে ফেলা হবে... এখন মহান কুর'আন, আল্লাহ্‌র রাসূল (সাঃ) এবং মুসলিম ভূমিসমূহের উপর আক্রমণ করা হয়, অথচ এধরনের আশ্রাসনের কোন প্রতিশোধ নেয়া হয় না! এটি শুধুমাত্র এই কারণে যে আমাদের একজন ইমাম, একজন খলিফা রাশিদাহ নেই, যিনি উম্মাহ-কে শত্রুদের ক্ষতি থেকে রক্ষা করতে পারেন। সহীহ মুত্তাফিকুন আলাইহি হাদিসে বর্ণিত আছে যে, তিনি (সাঃ) বলেছেন:

«إِنَّمَا الْإِمَامُ جُنَّةٌ، يُقَاتِلُ مِنْ وَرَائِهِ، وَيُنَقِّي بِهِ» “ইমাম একাই একটি ঢাল, যার পিছনে যুদ্ধ করা হয় এবং যার মাধ্যমে সুরক্ষা নিশ্চিত করা হয়” [বুখারী ও মুসলিম]।

পরিশেষে, আমি আপনাদের প্রতি আমার আহ্বানের পুনরাবৃত্তি করছি, হে ক্ষমতা ও সুরক্ষার অধিকারী ব্যক্তিবর্গ... কেবল আপনারাই পারেন হৃদয়ের সেই ক্ষতকে সারিয়ে তুলতে যা উম্মাহ'র এবং আপনাদের দ্বীনের শত্রুরা তৈরি করেছে। একমাত্র আপনারাই পারেন মুসলিমদের ভূমিসমূহে তাদের উপর যে অসম্মান নিপতিত হয়েছে তার অবসান ঘটাতে... অতএব আপনারা আপনাদের দায়িত্ব পালনের জন্য জেগে উঠুন, আল্লাহ সুবহানাছ ওয়া তা'আলা আপনাদের উপর রহমত বর্ষণ করুন। আমাদেরকে নুসরাহ্ (সামরিক সহায়তা) প্রদানের জন্য এগিয়ে আসুন, খিলাফতে রাশিদাহ্ প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে হিব্বুত তাহরীর-কে নুসরাহ্ প্রদান করুন। বর্তমান বাস্তবতার প্রেক্ষিতে বিজয় অর্জনের জন্য এটি কেবলমাত্র একটি উপায়ই নয়, বরং প্রথম সারির একটি বড় আবশ্যিক দায়িত্ব। প্রথমত, যে ব্যক্তি খিলাফত এবং বাইআত (আনুগত্যের শপথ) পাওয়ার যোগ্য খলিফাকে প্রতিষ্ঠা করার সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও তার দায়িত্ব পালন করে না, তার গুনাহ্ এতই বিশাল যে সে যেন ইসলাম-পূর্ব (জাহিলিয়াতের) যুগে মৃত্যুবরণ করেছে, রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর হাদিস এই গুনাহ্'র তীব্রতার প্রমাণ:

«وَمَنْ مَاتَ وَلَيْسَ فِي غُنْفِهِ بَيْعَةٌ، مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً» “আর যে ব্যক্তি তার কাঁধে আনুগত্যের বাইআত ব্যতিরেকে মারা যায়, সে জাহিলিয়াতের (ইসলাম পূর্ব যুগের) মৃত্যুবরণ করে” [মুসলিম]। দ্বিতীয়ত, মুসলিমগণ রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর দাফনের প্রস্তুতি গ্রহণ ও দাফনের দায়িত্ব পালনের আগে খলিফাকে বাইআত প্রদান করে। আর এসবই একজন খলিফার নিয়োগের গুরুত্বের কারণে করা হয়। তৃতীয়ত, উমর (রা.) তাঁর মৃত্যুর দিনে জান্নাতের সুসংবাদ প্রাপ্ত ছয়জনের মধ্য হতে একজনকে খলিফা নির্বাচনের জন্য তিন দিনের একটি সর্বোচ্চ সময়সীমা বেঁধে দেন। ঐ সময়সীমার মধ্যে যদি খলিফা নির্বাচন সম্পর্কে কোন সমঝোতা না হয়, তবে ভিন্নমত পোষণকারীকে হত্যা করার আদেশ দেন। এটা করা হয় সাহাবীদের (রা.) এক জমায়েতের মধ্যে, যাদের সম্পর্কে মন্দ কোন বিবরণী পাওয়া যায়নি। সুতরাং, এটি ছিল সাহাবায়ে কেরামদের (রা.) সর্বসম্মত ঐক্যমত বা ইজমাতুস সাহাবা। যাহোক, আমাদের ক্ষেত্রে “তিন দিনের বহু গুণ” বেশি সময় অতিক্রান্ত হয়ে গেছে! নিশ্চয়ই, খিলাফত প্রতিষ্ঠা একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়।

হে আল্লাহ'র সৈনিকগণ: আমরা বুঝতে পারি যে আমাদের জন্য খিলাফত প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে ফেরেশতাগণ আকাশ থেকে অবতরণ করবে না। বরং, আল্লাহ সুবহানাছ ওয়া তা'আলা শুধুমাত্র আমাদের সাহায্য করার জন্য ফেরেশতা পাঠাবেন, যদি আমরা খিলাফত প্রতিষ্ঠার জন্য আন্তরিকভাবে কাজ করি। এটি এমন একটি প্রতিশ্রুতি যা আল্লাহ'র কিতাবে নিশ্চিত করা হয়েছে:

«وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ» “তোমাদের মধ্যে যারা ঈমান আনে এবং সৎকর্ম করে, আল্লাহ তাদেরকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন যে, অবশ্যই তিনি তাদেরকে পৃথিবীতে শাসন কর্তৃত্ব দান করবেন, যেমনটি তিনি তাদের পূর্ববর্তীদেরকে দান করেছিলেন” [আন-নূর: ৫৫]। এই নিপীড়নমূলক শাসনের পরে এটি একটি গৌরবের সুসংবাদ, আল্লাহ'র রাসূল (সাঃ)-এর হাদিসে বর্ণিত হয়েছে যে:

«...» «ثُمَّ تَكُونُ مُلْكًا جَبْرِيَّةً فَتَكُونُ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ تَكُونُ ثُمَّ يَرْفَعُهَا إِذَا شَاءَ أَنْ يَرْفَعَهَا ثُمَّ تَكُونُ خِلَافَةً عَلَىٰ مِنْهَا جِ النَّبِيِّ» “এরপর আসবে জুলুমের শাসন, যতক্ষণ আল্লাহ চান ততক্ষণ তা চলবে, অতঃপর তিনি (সুবহানাছ ওয়া তা'আলা) তার অবসান ঘটাবেন, যখন তিনি তা অবসান করার ইচ্ছা করবেন, এবং এরপর আসবে খিলাফত, নবুয়্যতের আদলে।” এরপর তিনি (সাঃ) চুপ হয়ে গেলেন। [আহমাদ কর্তৃক বর্ণিত]। আমরা এটাও বুঝতে পারি যে, ইসলামের শত্রুরা খিলাফত পুনঃপ্রতিষ্ঠাকে অসম্ভব বলে মনে করে। তারা তাদের পূর্ববর্তীদের কথারই পুনরাবৃত্তি করে, তাদের মধ্য হতে যারা উপহাস করত, «غَرَّ هَؤُلَاءِ دِينَهُمْ» “এই লোকগুলোকে তাদের দ্বীন ধোঁকায়

ফেলে দিয়েছে” [সূরা আল-আনফাল: ৪৯]। যাহোক, যেহেতু এই কথাটি পূর্বে যারা বলত তাদের জন্য অভিশাপ ছিল, কারণ আল্লাহ সুবহানাহ্ ওয়া তা'আলা তাঁর দ্বীনকে মহিমাম্বিত করেছিলেন এবং তাঁর (সুবহানাহ্ ওয়া তা'আলা) বান্দাদেরকে বিজয় দান করেছিলেন, সেহেতু ঠিক একইভাবে আজ যারা এই কথা বলে তাদের জন্য তা অভিশাপ, কারণ সর্বশক্তিমান এবং মহাজ্ঞানী আল্লাহ সুবহানাহ্ ওয়া তা'আলা তাঁর নিষ্ঠাবান বান্দাদের সাথে রয়েছেন, যারা তাদের অন্তর ও সামর্থ্য দিয়ে নিষ্ঠার সাথে কাজ করছে, আল্লাহ সুবহানাহ্ ওয়া তা'আলা বলেন: ﴿إِنَّ اللَّهَ بِأَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا﴾ “নিশ্চয়ই, আল্লাহ তাঁর কার্যসম্পাদন করবেন। আল্লাহ সবকিছুর জন্য একটি পরিমাণ স্থির করে রেখেছেন” [সূরা আত-তালাক: ৩]। আল্লাহ সুবহানাহ্ ওয়া তা'আলা'র অনুমতিক্রমে প্রতিটি দিন অতিবাহিত হওয়ার সাথে সাথে বিষয়টি তার ক্রদর তথা “নির্ধারিত সময়ের” নিকটবর্তী হচ্ছে। ﴿وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هُوَ قُلْ عَسَىٰ أَنْ يَكُونَ قَرِيبًا﴾ “তারা জিজ্ঞাসা করে: “সেটা কখন হবে?” বলুন: “সেটা হবে, সম্ভবতঃ শীঘ্রই!” [সূরা আল-ইসরা: ৫১]।

ওয়া আলাইকুম আসসালাম ওয়া রহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু,

আপনাদের ভাই, আতা বিন খলিল আবু আল-রাশতাহ্,
হিবুত তাহরীর-এর আমীর

২৮শে রজব, ১৪৪৪ হিজরী
১৯শে ফেব্রুয়ারী, ২০২৩ খ্রিষ্টাব্দ